শিশু-কিশোর গল্প

ঠাকুরদা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

একগ্রামে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তাঁরা তাঁকে বলত ঠাকুরদাদা। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশসুদ্ধ লোকেও তাঁকে ঐ নামেই ডাকত।

ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেত, আর তাঁকে জ্বালাতন করত তার চেয়েও বেশি। ঠাকুরদা ভারি পণ্ডি আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তাঁর একটা পাগলামি ছিল। পেয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা সে কথা খুবই জানত আর তা নিয়ে ভারি মজা করত।

ঠাকুরদা রোজ তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক-একটা দুষ্ট ছেলে দাড়ি পরে, লাল পাগড়ি এঁটে, মালকোচ্চা মেরে লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত, 'ভওয়ানী ভটচাজ কোন হ্যায়?' ঠাকুরদা তাতে বিষম থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়েই যদি লাল পাগড়ির খানিকটা দেখতে পেতেন, তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায় সে কথার খবর নেবার অবসর তাঁর থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়া একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন। ছেলেরা বলে যে, তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হত। কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

যা হোক, এমন বিষম ভয়ের কাণ্ডটা যে ছেলেদের কাজ, এ কথা মুহূর্তের তরেও ঠাকুরদার মাথায় আসত না। তিনি ছেলেগুলিকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসতেন। তাঁর কুলগাছটিতে কুল পাকলে তাদের সকলকে ডেকে ডেকে একটি-একটি করে কুল প্রত্যেকের হাতে দিতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না- একটি বেশিও কখন কাউকে দিতেন না। সেই পরগণার ভিতরে এমন মিষ্টি কুল আর কোথাও ছিল না। কাজেই, একটি খেয়ে ছেলেদের যেমন ভাল লাগত, আর খেতে না পেলে তাদের অমনি কষ্ট হত।

তবুও এমন কথা শোনা যায় নি যে, ঠাকুরদার দেওয়া ছাড়া আর-একটি কুল কেউ কখনো তাঁর গাছ থেকে খেতে পেরেছে। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে সেই কুল গাছটি পরিস্কার দেখা যেত। সেদিকে কাউকে যেতে দেখলেই তিনি 'কে-রে-এ বলে এমন বিষম হাঁক দিতেন যে কি বলব! তখন আর হাত-পা সামলে ছুট দেবারও উপায় থাকত না। দু মাইল দুরে থেক লোকে বলত, 'ঐ রে! ঠাকুরদা তাঁর কুল আগলাচ্ছেন।'

খালি একবার ছেলেরা ঠাকুরদার কাছ থেকে একপোয়া সন্দেশ আদায় করেছিল। ঠাকুরদা চন্ডীমণ্ডপের সামনে বসে একমনে পুঁথি লিখছিলেন। তিনি দেখতে পান নি যে, এর মধ্যে ও পাড়ার বোসেদের বানরটা কেমন করে ছুটে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, আর তার পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো বাঁধানো হুঁকোটি নিয়ে গাছে উঠেছে। তারপর তামাক খেতে গিয়ে দেখেন, কি সর্বনাশ! বানরটিকে তিনি কত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কত লম্বা লম্বা সংস্কৃত বকুনি বকলেন, কিছুতে তার কাছ থেকে হুঁকোটি আদায় করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে সে বেটা তাঁকে গোটাদশেক ভেংচি মেরে হুঁকোসুদ্ধ পাশের বাড়ির আমবাগানে চলে গেল।

সেদিন ছেলেরা না থাকলে ঠাকুরদার আবার তাঁর হুঁকোর মুখ দেখবার কোন আশাই ছিল না। তিনি তাদের সন্দেশ কবুল করে অনেক কষ্টে তাদের দিয়ে বানরের হাত থেকে হুঁকোটি আদায় করালেন। তার পরদিনই নিজে গিয়ে বেচু ময়রার দোকান থেকে তাদের জন্যে এক পোয়া সন্দেশ কিনে আনলেন। সে সন্দেশ খেয়ে নাকি তারা মুখ সিটকিয়েছিল। ঠাকুরদা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, 'সন্দেশটা বড্ড মিষ্টি।' ঠাকুরদা তখন খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই ত, আমি জানতুম না যে তোমরা তেতো সন্দেশ খাও। আমি মিষ্টি সন্দেশই কিনে এনেছি।'

পরসা খরচ নিয়ে কিন্তু ঠাকুরদার একটু বদনাম ছিল। ঐ যে হুঁকোর খাতিরে ছেলেদের একপোয়া সন্দেশ কিনে খাইয়েছিলেন, তা ছাড়া আর তাঁর জীবনে তিনি কখনো কাউকে কিছু কিনে খাওয়ান নি। লোকে বলত, তাঁর ঘরের ভিতরে তিন-জালা টাকা পোঁতা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এমনভাবে চলতেন যেন অনেক কষ্টে তাঁর দুটি খাবার জোটে, সেও বুঝি-বা একবেলা বই দুবেলা নয়। একদিন দিদিমা ডাল রাঁধতে গিয়ে তাতে একটু বেশী ঘি দিয়ে ফেলেছিলেন। সেই অপরাধে নাকি ঠাকুরদা দুমাস তাঁর সঙ্গে কথা কন নি।

ছেলেরা তাঁর সেই সন্দেশ খেয়ে অবধি তাঁর উপর কম চটে ছিল না। না চটবেই বা কেন? সেই হতভাগা বানরটার কাছ থেকে হুঁকো আদায় করতে গিয়ে কি তারা কম নাকাল হয়েছিল? কুড়ি জন মিলে তিনটি ঘন্টা ধরে তারা সেদিন কত গাছই বেয়েছে, কত ছুটোছুটি করেছে, কত কাদাই লাগিয়েছে, কত বিছুটির ছ্যাঁকাই খেয়েছে। তার পুরস্কার কিনা অমনিতর একপোয়া সন্দেশ!

তখন ছিল পুজোর সময়। কুমোরদের বাড়িতে অনেক ঠাকুর গড়া হচ্ছিল, তার তামাশা দেখবার জন্যে সকালে বিকালে ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে যেত। সেইখানে তাদের একটা মস্ত মিটিং হল। ঠাকুরদাকে জব্দ করতে হবে। তিনি যেমন সন্দেশ খাইয়েছেন, তাঁকে দিয়ে কিছু বেশী হাতে টাকা খরচ করাতে পারলে তবে তার দুঃখটা মেটে। কিন্ত এমন লোকের পয়সা ত সহজে খরচ করানো যেতে পারে না, তার কি উপায় হতে পারে।

কতজনে কত কথা বলতে লাগল, কেউ বলল, ‘চল ঠাকুরদার কুলগাছ কেটে ফেলি।’ কেউ বলল, ‘তার হুঁকো লুকিয়ে রাখি।’ কিন্তু এ-সব কথা কারুর পছন্দ হল না। এমন কুলগাছটা কাটলে ভারি অন্যায় হবে। হুঁকো লুকিয়ে রাখলেও শেষটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-সব করলে তাঁকে আর টাকা খরচ করানো হল কই? ঠাকুরদাকে ছেলেরা আসলে

ভালবাসত, নাহক তাঁর লোকসান করাতে কারো ইচ্ছা ছিল না। কাজেই এ-সব কথায় সকলের অমত হল। এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে হবে যে সেটা তাঁর ক্ষতির মধ্যে ধরা না যেতে পারে।

ছেলেরা দেখল, কাজটি তেমন সোজা নয়। বুড়ো কুমোর এর মধ্যে এসে বুদ্ধি জুগিয়ে না দিলে তাদের পক্ষে এর একটা মতলব ঠিক করাই ভার হত। বুড়ো যে যুক্তি বলল, সে ভারি চমৎকার। ছেলেরা তার কথায় যার পর নাই খুশি হয়ে ঘরে চলে গেল। ঠিক হল, পরদিনই সেই কাজটি করতে হবে।

রাত থাকতেই ঠাকুরদার ঘুম ভাঙ্গে, তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সুর ধরে শোলোক আওড়ান। তারপর ভোর হবার একটু আগে উঠে, স্নান তর্পণ সেরে, শেষে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসেন। সেদিনও দোয়েল ডাকবার আগেই তিনি জেগে সবে বলেছেন, 'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী'-অমনি বাইরে কে যেন ডাকল, ' ভওয়ানী ভট্চাজ ঘরমে হ্যায়?'

আর ঠাকুরদা শোলোক আওড়ানো হল না। স্নান আহ্নিক আজ তিনি খিড়কির পুকুরেই সারলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লেখার কাজটিও আজ বন্ধ রইল-তার চেয়ে দিদিমার রান্নাবান্নার খবর নেওয়াই বেশি দরকার মনে হয়েছে। এমনি ভাবে দুপুর অবধি কেটে গেল। এরপর যখন আর কেউ 'ভওয়ানী ভটচাজ' বলে ডাকল না, তখন ঠাকুরদা সাহস পেয়ে ভাবলেন, একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না কেন!

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরে এসে ঠাকুরদা দেখলেন-কি সর্বনাশ! কি চমৎকার! তার মণ্ডপের মাঝখানে দূর্গা প্রতিমা ঘর আলো করে বসে আছেন। ঠাকুরদার আর পা সরল না। তিনি সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলেন-হায়, হায়! কোন্ শয়তান এমন কাজ করল! এই প্রতিমা আমার ঘরে রেখে গেছে, এখন একে পূজো না করলে মহাপাপ হবে। আর পূজো

করতে গেলেও যে তিনশোটি টাকা'র কম লাগবে না। বাবা গো, আমি কোথায় যাব!

যা হোক, ঠাকুরদা কৃপণ হলেও অতি ধার্মিক আর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তখনই ভাবলেন-আর দুঃখ করে কি হবে? ঘরে টাকা রেখেও আমি সেবায় হেলা করেছিলাম, তাই দেবতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভালোই হল, এখন থেকে আমি ফি-বছর দুর্গোৎসব করব।

ততক্ষণে ছেলেদের দুটি একটি করে প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজটি ত তাদেরই, তারাই ঠাকুরদাকে পেয়াদার ভয় দেখিয়ে বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে সেই অবসরে প্রতিমাটিকে এনে মণ্ডপের ভিতরে রেখে গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে ঠাকুরদারও আর সে কথা বুঝিতে বাকি রইল না। তখন তিনি বললেন, 'ভালই করেছ দাদা, বুড়ো পাপীর সুমতি জন্মিয়ে দিয়েছ। তোমরা বেঁচে থাকো। আমি খালি ভাবছি-এত বড় ব্যাপার, আমার লোকজন কিছু নেই, আমি কুলোব কি করে?'

ছেলেরা ভেবেছিল, ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করবেন। তার বদলে তিনি এমন কথা বলবেন, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তাতে ভারি খুশি হয়ে বলল, 'তার জন্য চিন্তা কি, ঠাকুরদার? আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে হুকুম দিন।' অমনি ঠাকুরদার মুখ ভরে হাসি ফুটে উঠল, তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। ছেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে, গাল টিপে আর নাকে চিমটি কেটে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

এবারে ঠাকুরদা যে সন্দেশ এনেছিলেন, তা খেয়ে আর কারো নাক সিটকাতে হয় নি।